# ...ও বেলেমাই

-জীবন-জীবিকা ও সাহিত্য

দ্বিতীয় সংখ্যা - মার্চ-২০২৩

**Volume-II, Issue-I**
**( 2023 )**

বাংলায় বিশেষ নদীকেন্দ্রিক গবেষণা ও সাহিত্য চর্চার প্রথম ওয়েবসাইট-...ও কেলেঘাই

## একটি নদীর নাম কেলেঘাই

ইচ্ছে হয় হিজলের শেকড় ছুঁয়ে
স্পর্শ করি নাভিমূল তার
জন্মের স্বাদ পেতে ছুটে যা ইবাদিনা গ্রামের সবুজ ছায়ায়
শুয়ে থাকি ঘাসের শয্যায়...
আবার মিলনে প্রাপ্তি ভেবে
হলদির উপকূলে শান্তির খোঁজ পাই
আজো সে সহজিয়া নারী
আমার নদী, তোমারও তো
...ও কেলেঘাই।

ই-মেল- o.keleghai@gmail.com মোবাইল- ৯৬৪১৭৮৩৫৩৪

**www.keleghai.in**

"...ও কেলেঘাই" একটি ওয়েব জার্নাল । কেলেঘাই একটি নদীর নাম। যার বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে রয়েছে আঞ্চলিক ইতিহাসের সমৃদ্ধ উপাদান। এই জার্নালের প্রধান দুটি উদ্দেশ্যের মধ্যে-

প্রথমতঃ তীরবর্তী সমাজের জীবন জীবিকায় কেলেঘাই নদী কতখানি অপরিহার্য ছিল এবং আছে তার মৌলিক অন্বেষণ।

দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যের বিচিত্র শাখা প্রশাখার কল্পলোকে কেলেঘাই নদীকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়া।

উপদেষ্টা- মনোতোষ আচার্য

সম্পাদক- ড. মৃন্ময় মণ্ডল

সহকারী সম্পাদক- শুভজিৎ জানা

পর্যালোচক- বিষ্ণুপদ দাশ

'...ও কেলেঘাই'র পক্ষে ড.মৃন্ময় মণ্ডল কর্তৃক পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ৭২১৪৫৪ থেকে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস- কৌশিক রায়

মুদ্রণ- কল্পনা জেরক্স এন্ড প্রিন্ট, নৈপুর, পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর

---

সম্পাদকীয় দপ্তর এবং লেখা পাঠানোর ঠিকানা

'...ও কেলেঘাই', পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর- ৭২১৪৫৪

ওয়েবসাইট- www.keleghai.in ইমেল-o.keleghai@gmail.com

মোবাইল-৯৬৪১৭৮৩৫৩৪

মূল্য—২১টাকা

# -কলমে-

**কল্পবোধ-** শিবরাম ভূঞ্যা ।। সুপর্ণা রায়।। মনোতোষ আচার্য।। মোহন দাস ।। সুকদেব বর্মণ ।। প্রাণনাথ শেঠ ।। বিকাশ চন্দ ।। কৌস্তভ শতপথী ।। বিষ্ণুপদ দাশ।। শুদ্ধসত্ত্ব বর্মণ।।

**অনুগল্প-** বিষ্ণুপদ আচার্য্য

**অনুপ্রবন্ধ-** মৃন্ময় মণ্ডল ।। সুব্রত জানা ।। শ্রী দেবাশিস কুইলা।। চৈতালি কুণ্ডু নায়েক ।। কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তী ।।



...ও কলেমাই

# -অল্পকথায়-

'নদী' জীবনের মতো বহমান, 'নারীর' মতো নীরবে উদ্ভিন্ন। সভ্যতার উদয় হতে নদী মাতৃরূপে পূজিত হন। তার সৃষ্টিজাত নির্মাণ, নির্ভরতার আবেশে ঋণী এই পার্থিবজগত। বহু জনপদের আজন্ম ইতিকথা বহমানিত তার অবিরাম ধারা-উপধারায়। জনপদের প্রকীর্ণ কলতানে যেমন নীরব তার অনিন্দ্যকীর্তন, তেমনই আছে বেদনার জগতও। তার গভীর খাতে চিহ্নিত কত পারাপারের ইতিকথা যা বিস্মৃতির অতলতলে ডুকরে মরে। হারানো সেই দিনের নস্টালজিক পটভূমি, অক্ষর সজ্জায় মেলে ধরতে "...ও কেলেঘাই'র" পথচলা। নিতান্তই সাহিত্যের নিবিড়তায় আবিষ্ট না হয়ে, তীরবর্তী জনজাতির নদীমাতৃক অতীত ঐতিহ্য লেখনীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক "...ও কেলেঘাই"র কলেবর। তাই "...ও কেলেঘাই" খুঁজে বেড়ায় অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষকদের, যাদের লেখনীর মাধ্যমে কেলেঘাই হয়ে উঠবে বিশ্বের আঙিনায় এক স্রোতস্বিনী- জীবন্ত নদী।

"...ও কেলেঘাই"র জন্যে দ্বিতীয় সংখ্যায় যারা কলম ধরেছেন, তাদের প্রতি রইলো বাসন্তিক শুভেচ্ছা । উপদেষ্টা ও পর্যালোচকদের সুচিন্তন মতামত সর্বদা "...ও কেলেঘাই"কে মোহনা প্রাপ্তির দিকে ধাবিত করবে এই আশা রাখি।

আনুচ্ছিকভাবে কিছু ত্রুটি থাকলে পাঠকগন তা ক্ষমার চোখে দেখবেন ।পাঠকবর্গের গঠনমূলক মতামত আগামী সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে উদ্দীপনার রসদ যোগাবে।

ড. মৃণ্ময় মণ্ডল
সম্পাদক
সহকারী সম্পাদক: শুভজিৎ জানা
মার্চ-২০২৩

## ।।হ্যালো কেলেঘাই।।

শি ব রা ম ভূ ঞ্যা

কেলেঘাই কেলেঘাই, হ্যালো কেলেঘাই ;
আজ তোর দেখা পাবো কোথা গেলে ভাই?
বলেছিলি পৌষের ঠিক শেষবেলা
কোথায় বসবে নাকি খুব বড়ো মেলা?
ঠিক ঠিক, মনে পড়ে তুলসীচারায়;
মহাধুমধাম তবে আজ ও পাড়ায়!
ভক্তরা মাটি তুলে তো রবুক থেকে
তুলসীমঞ্চে এসে দেয় নাকি মেখে।
শুনেছি এমেলা ভারী চোখ জুড়ানো;
পাঁচশত বছরেরও বেশি পুরানো।
চলবে তা মেলা কতদিন ধরে তবে?
সাতদিন, বলিস কী! ভারী মজা হবে।
পাদুকা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠের
রকমারি তুলো থেকে জিনিস কাঠের;
সবকিছু পাওয়াযায় খুব সস্তায়
যায় না যে মেলা, তবে ভারী পস্তায়!
কেলেঘাই কেলেঘাই, হ্যালো কেলেঘাই ;
তাহলে জলদি ফোন রেখে চলেযাই।

## ।।সেই নদীটি।।

সু প র্ণা রা য়

গর্ভধারিণীর স্তনবৃন্ত চুঁইয়ে থাকা একফোঁটা অমৃতের মতো
আমার কেলেঘাই,
সহস্র বছর ধরে বয়ে বেড়ায় কত মানুষের দুঃখের যাপন।
জ্যোৎস্না রাতে ঝিকিমিকি জলে কুল কুল হাসিতে যে প্রাণ
ভরিয়েছে।
নির্যাতিতা যে এলোকেশী ছুটে গেছে তার মাঝে মিশে যেতে
তাকে সহনতার আদর দিয়েছে সে মাতৃরূপিনী।
ব্যর্থ প্রেমিকের নিকোটিনের ধোঁয়া আর আবছা চোখের দৃষ্টিতে
মিশে থাকা ঠান্ডা স্রোত যে নদীটি ,
জীবনে জীবন দিয়েছে , মৃত্যুতে বিশল্যকরণির সুধা
যার সুর গ্রামের পর গ্রামের প্রাণ ,
কত ইতিহাস বুকে এখনো তো বয়েচলে
তোমার আমার সবার কত আপনার কেলেঘাই।

## ।।এসো মেঘ গল্প করি।।

ম নো তো ষ আ চা র্য

ধান জমির আলে শুয়ে থাকা শৈশব
উঁকি মেরে দেখে ঘুড়িওড়া রোদের পাঁচালি...
পাড়ায় পাড়ায় সীতাহরণের কৈশোর
পুকুরের জলে দম আটকে পরীক্ষা নেয়
এক থেকে একশো গুনতির...
শরতের বিকেলের মায়াময় রোদ্দুরে
বস্তা পিঠে এক আল থেকে অন্য আলে ঘাস খুঁজে খুঁজে
হারিয়ে ফেলেছি কৈশোর ফড়িংডাঙার বিলে...
হেমন্তের দুপুরে বনে বনে পাতা কুড়িয়েছি
পাতার আগুনে সেদ্ধ হয়েছে সংসারের খিদে...
জনমদুখিনী মা অশ্রুতে প্রতিদিন ভিজিয়ে দিতেন
কুলদেবতার থান,
কেলেঘাই পাড়ে বেজে উঠতো শাঁখ অন্ধকার কাঁপিয়ে...
ধুলো খেলার উঠোন পেরিয়ে, মাড়ো ওময়দান পেরিয়ে
এসে পড়লাম বড়ো রাস্তায়
হাওয়াই চটি পায়ে দে-দৌড়ে ছুঁয়ে ফেললাম যৌবন ...
মাড়িয়ে সাঁকোর জল উদাসীন মুগ্ধতার শেষে
এসো মেঘ গল্প করি বাণপ্রস্থে পরীদের সাথে
পেড়ে আনি অরণ্যের মধু
বিষ পিঁপড়ের ভয়ে লতাগুল্মে আশ্রয় নেবো।

## ।।নদী।।

মো হ ন দা স

আমার ঘরের নিঃসঙ্গ জানালার পাশে
যে নদীটির বসবাস
আমি তাঁকে ছুঁতে চেয়ে কোনওদিন প্রেমপত্র লিখিনি
কোনওদিন তাঁকে ঘুমের ভিতর জড়িয়ে ধরে
রাত্রি ঝরাইনি কিংবা আনমনে
তাঁকে নিয়ে হারিয়ে যাইনি নির্জন প্রান্তরে, পুরনো মন্দিরে
অথচ ডুবেগেছি রোজ অন্তরে অন্তরে।

## ।।আমি কেলেঘাই।।

সু ক দে ব ব র্ম ণ

জন্ম আমার কলসিভাঙা গ্রামে,
পাথর পেরিয়ে মিশেছি কাদায় স্বচ্ছ ও ঘোলা জলে
আমার বাহু আনেক স্রোত,
চন্ডিয়া ও কপালেশ্বরী
বাঘুই কেমন ঘোমটা ঘেরা
মুখটা যে' তার ভারী।
মানুষ সবাই জীবন ভরে
আমার বুকের মাঝে
নৌকা শুধু নয় যে চালায়, চালায় কাটাকুটি
প্রশ্ন খানি কেউ করেনা
মানায় না যে মুখে।

## ।।কেলেঘাই।।

প্রা ণ না থ শে ঠ

কলসিডাঙায় জন্মনিল – একটা ছোট্টনদী
ছুটন্ত সেই নদীর সঙ্গে - আয়রে, ছুটবি যদি।

সঙ্গী হল তিন সখী তার – তারাও মুক্ত হিয়া
কপালেশ্বরী, বাগুই ও – অন্যটি চণ্ডিয়া।

দুরন্ত সেই ছোট্ট নদী – নামটি তার কেলেঘাই
সেই চরে তো আমার বসত – তারই বন্দনা গাই।

ছুটতে ছুটতে এবার দেখা – আর এক ছন্নমতি
আমরা তাকে সবাই চিনি – সেই তো কংসাবতী।

কেলেঘাই ও কংসাবতী – মিলে গিয়ে জলদি
হল কিনা একটি নদী – ঠিক ধরেছো হলদি।

হলদি চরে শিল্প-শহর – হলদিয়াতো জানা
ডাইনে জাগে নয়া-যে-চর – মিলছে বিশাল ডানা।

সাগর ছোঁয়ার ইচ্ছে নিয়ে- মিশে হুগলী'র সাথে
কেলেঘাই সে হলদি নামে – আনন্দেতে মাতে।

আজ শুভদিন এসো সবাই - কেলেঘাই-এর চরে
কথায় গানে হিল্লোল তুলে – রূপকথার এই গড়ে।

## ।।জলের সিংহাসন।।

বি কা শ চ ন্দ

শান্ত জলের ভেতর নড়ে ওঠে উচ্ছল মায়ামৃগ
অজস্র আমন ধানের ক্ষেত জানে
অপেক্ষায় জলের মগ্নতা
আড়াআড়ি বাঁধের ভেতর প্রতীক্ষায় স্রোত
নদীখাতে নির্ঘুম জলের প্রবাস নম্র স্রোতে
এদিক ওদিক সবুজ জানে জলের জীবন ধারা।

জলের ভেতর পাপপূন্য কে জানে
খলবল স্রোতে মাছেদের রূপোলী আলো ঘর
নিঃসাড় আহ্বানে ফুলে ওঠে জলের ভৈরবী
দু' পাড়ে জুবুথুবু জমজমা সব্জি সিদ্ধিদাতা
স্বভাব স্নানের নেশায় নিমেষে একাকার ত্রিসীমানা।

দু'পাড়ে অস্থির মন্দির মাজার ধর্মাধর্ম ব্যাকুল
সকল ভেসে যায় গতিপথে জলের চেতনায়
পাক খায় জলের পাকদণ্ডী অখণ্ড ইতিহাস
জলই জানে জলের আপন গর্জন শাসন
নির্ভয়া স্রোতে জলের রানী জানে
জলের শরীরে ভাসে জলের সিংহাসন !

## ।।ওহে কেলেঘাই।।

কৌ স্ত ভ  শ ত প থী

জন্ম হতেই অকিঞ্চন প্রবাহতে ও তাই
তোমার আমার প্রতিবেশী কাছের কেলেঘাই
উদযাপনের রসদ ও নেই উন্মাদনার ঘাট
দুই পারেতে হাজার লোকের দিয়েছে ঠাটবাট

নদীর নামে প্রশ্ন এলে দেখতে কেমন তাকে
শীতের ভোরে হাঁটতে বেরোই কেলেঘাইয়ের বাঁকে
চিনতে তাকে কষ্ট যেজন আলোর বিপরীতে
মাঝির কাছে খবর নিও ভাটিয়ালির গীতে

পরম্পরায় দুহাত দিয়ে আগলে রাখো নদী
কেলেঘাইয়ের মতন করে বইবে নিরবধি
ফুঁসলে আবেগ বর্ষা দিনে বন্যা যদি আনে
ভালোবাসার সুর বেঁধে দাও অভিমানীর কানে

## ।।ওগো কেলেঘাই।।

বি ষ্ণু প দ দা শ

কেলেঘাই ছোট্ট নদী- তোমার তীরে বসত গড়ি
বুঝিনিতো এমন খেলা আমরা এখন সবাই মরি।
ফি বছর বন্যা আসে, মরা গাঙে জোয়ার ডাকে-
ভাঙল কত বসত বাড়ি- শস্যহানি- সর্বনাশী।
এমন ধারা তোমার কেন? দরদ আছে শূন্য যেন;
প্রলয় নাচন নাচ কেন? বুঝে গেছি অভিমানী।
তুমি যদি প্রসন্না হও বরাভয় পাবো জানি-
তোমার বুকে সুধা রাশি- বাঁচবো মোরা এই বুঝেছি
তবু মানুষ এমন নিঠুর তোমার পথ রুদ্ধ করে
মুক্তধারার এইতো খেলা জানিনা তার ছল চাতুরী।

# ।। দাদু, তোমাকে।।

## শুদ্ধসত্ত্ববর্মণ

না, এ লেখা কেলেঘাই, আমার আজন্মের সাথি, আমার সেই প্রিয় নদী কে নিয়ে সরাসরি নয়। বরং এ লেখা এমন এক মানুষকে নিয়ে, যাঁর আমৃত্যুসঙ্গী ছিল এই নদী। এই নদীকে ভর করেই শুরু হয়েছিল তাঁর সংগ্রামমুখর জীবন। পরবর্তী সময়ে শিক্ষকতাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করলেও, এ নদীর সঙ্গে যাঁর নাড়ির বন্ধন ছেঁড়েনি কখনও। সেই মানুষটি শ্রদ্ধেয় ঈশ্বর অনন্ত কুমার মন্ডল, আমার দাদু (মাতামহ)- তাঁর উদ্দেশে লেখা কটি চরণ– হয়তো বা কেলেঘাইকে প্রকারান্তরে স্মরণ ও শরণ!

আজ তোমার কথা বারবার মনে পড়ে।
তোমার দ্বিচক্রযানের পেছনে বসে আমি,
তুমি তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে চলেছ।
হাওয়া বইছে শন-শন
গল্পের কথা গুলো ভাসছে- ভেসে যাচ্ছে হাওয়ায়।
গভীর রাতে নদীর বুকে নৌকোর হাল ধরে বসে তুমি,
প্রবল ঘূর্ণির মাঝখান দিয়ে নৌকো চলে–
হাল ধরে যে মাঝি, তার প্রতি গভীর আস্থায় অন্যরা নিশ্চিন্তে।
আমার সত্তাকে জাগাও তুমি, গমগমে স্বরে আবৃত্তি
শোনাও। রবীন্দ্রনাথের 'দীনদান'।
তোমার দানে সিক্ত আমরা।
তুলসী-চারার মেলায় প্রাপ্তি খেলনা বড়ো বাস, খঞ্জনি, আরো কত কী!
তোমার ছাত্রের পছন্দ করা বাইনোকুলার কেনা হয়নি।
ওই বাসের মতো গতিময় জীবনের হাতছানি
তোমার সাইকেলের অবিরাম গতি দাও।
আমৃত্যু যেন চলতে পারি নির্ভীক।

# ।। ও নদীরে..... ।।

বি ষ্ণু প দ আ চা র্য্য

তারাপদ যেন জসীমউদ্দীনের রূপাই। শাল-শিরিষ মহুয়ার জঙ্গলে তার শৈশব কাটে। তারাপদ খুব ছোট থেকেই পিতৃহীন। মা পরের বাড়িতে কাজ করে খুব কষ্ট করেই তাকে পড়াশোনা করিয়েছেন। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সবং কলেজে পড়ার জন্য সে দেহাটী আসে স্থানীয় দুড়িয়ার এক দূরসম্পর্কের হাত ধরে। গৃহস্থের ছেলেমেয়েকে পড়ানোর চুক্তিতে থাকা খাওয়ার রফা হয়। বিনিময়ে সবং কলেজে পড়া। পড়ার কিছু খরচ যোগান দেন দুড়িয়ার আত্মীয়। গাছ গাছালিতে ভরা দেহাটী গ্রাম। বাংলার স্নাতক নিয়ে পড়া তারাপদর কাছে গ্রামটি যেন ঘোমটা দেওয়া লাজুক প্রেমিকা। কেলেঘাই এর পাড়ে তুলসীচারার মেলায় কত বার যে গেছে তার মনে নেই। সকালে বিকল বেশির ভাগ সময় কাটে কেলেঘাই চরে। কখনো কখনো জেলেদের সাথে মাছ ধরায় হাত লাগায়। কলেজে পড়ার ফাঁকে হাত খরচ চালানোর জন্য দুএক টিটিউশনি করে। স্থানীয় গার্লস স্কুলের মেধাবী ছাত্রী সুমনাকে পড়ায় তারাপদ। তারাপদর সহজসরল কথা বার্তায় সুমনা খুব মজা পায়। সে দশম শ্রেণীর ছাত্রী। তারাপদ যেন তার খেলার সাথী। তাই এক বারের পড়া সে তিনবার বুঝে নেয় তারাপদর কাছ থেকে। পড়ানোর ফাঁকে স্কুলের বান্ধবীদের যাবতীয় গল্প শুনতে হতো তারাপদকে বাধ্য হয়েই। প্রায়ই রাতে সুমনাদের বাড়ি থেকে খেয়ে ফিরত তারাপদ। সুমনার গানের স্কুলের গান শোনার জন্যও তাকে যেতে হতো। সুমনা যে বছর উচ্চমাধ্যমিক, সে বছরই তারাপদ এম.এ পাস করল। সুমনা এখন

একটু একটু বুঝতে পারে যে তারাপদর সঙ্গে তার একটা মানসিক যোগ তৈরি হয়েছে। সারাদিনে একবার তাকে না দেখলে তার মন ভালো লাগতনা। একদিন সুমনাকে কলেজে ভর্তি করানোর জন্য তারাপদ সবং গেল। সারাদিন তার সঙ্গে কাটালো। তারাপদ এখন এস. এস. সি. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাই সবদিন এখন সুমনার বাড়ি যায়না। একদিন সুমনার বাবা ডেকে পাঠালেন তারাপদকে। সুমনার মা ও বাবা তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রস্তাবটি রাখলেন। তাঁরা তারাপদকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চান। তারাপদর বুকে তখন হাজার পাখির ছট ফটানি। সেদিন সন্ধ্যায় মুখ নিচু করে একটু ভাববার সময় নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল তারাপদ। সুমনা গেট পর্যন্ত এগিয়ে ও এসেছিল। সারারাত দুচোখ এক করতে পারেনি তারাপদ, ছট ফট করতে থাকে সে। সে যেন প্রকৃত অর্থে রবি ঠাকুরের তারাপদ। মানবিক বন্ধন তার কাছে তুচ্ছ। মহাবিশ্বের অণু পরমানুর বন্ধন, দিগন্ত বিস্তৃত মহাকাশের অজানার হাতছানি, জেলে দের ডিঙি নিয়ে এগিয়ে চলার গান, দূর আকাশের কোন এক নামনাজানা গাংচিলের ডাক তাকে উদাস করে দেয়। নিমেষে বেরিয়ে আসে বাইরে, এক দৌড়ে কেলেঘাই এর চর। কেলেঘাই ও নিজের মধ্যে কোন প্রভেদ খুঁজে পায়না। কেলেঘাই যেন সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে এগিয়ে চলেছে নিজের ছন্দে। দুদিকে সারিবদ্ধ বনস্পতি।, হোগলার জঙ্গল, কাশফুল যেন তার এগিয়ে চলার সঙ্গী। একটি ছোট ডিঙ্গি নিয়ে কেলেঘাই এর স্রোতে পা বাড়ায় তারাপদ। গুনগুন করে গাইতে থাকে--------

ও নদীরে. ..... / একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে,
বল কোথায় তোমার দেশ / তোমার নেই কি চলার শেষ. .....

# ।।রূপসী বাংলার হিজল গাছ।।

মৃ ন্ম য় ম ণ্ড ল

বৈঠা লেগেছে হিজলের ঘাটে
আয় তোরা সব কাদা মাটি মেখে
নাইতে যাবি হিজল পাড়ায়...

প্রকৃতির রূপমাধুর্য বর্ণনায় হিজল গাছ বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ লাবণ্যে উদ্ভাসিত। এ এমনি এক বৃক্ষ যা কবি জীবনানন্দকে ভীষণ ভাবে আবিষ্ট করেছিল। তাই কোন সূর্যাস্তের গোধূলি লগ্নে একা পথ চলতে চলতে কবি শুনতে পান-

"পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে"

আবার বিদ্রোহী কবির প্রিয়া সন্তর্পণে অভিসারে ছুটে যায়-

"হিজল বিছানো বনপথ দিয়া
রাঙায়ে চরণ আসিবে গো প্রিয়া"

একটা সময়ে কবিদের জীবন-যৌবন জুড়ে হিজল গাছ প্রেম ও কল্পনার সিম্বলিক পরিচয় হিসাবে উঠে এসেছে বাংলা সাহিত্যে। এ তেমনি একটি গাছ যার ছায়া কবি, সাহিত্যিকদের থমকে দেয় একলহমায়। বিস্তীর্ণ জলাভূমির বা নদীর ধার বরাবর হিজল ফুলের গন্ধে নিমগ্ন প্রজাপতি, ভ্রমর, জলফড়িং, নানান পাখিদের যেমন আকৃষ্ট করে-তেমনি বাদ যাননি কবি কূল। বিশেষত গাঙ্গেয় বদ্বীপ সমভূমি এদের সৌন্দর্যের সমাহার চোখে পড়ার মতো। সারিসারি হিজল গাছ নদীর অববাহিকায় ঋতু বৈচিত্রের পরিচয় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। শাখা

প্রশাখার মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিল নদীময় জীবনের খুঁটিনাটি আর জীবিকার পাশে থাকার অঙ্গীকার।

প্রতেক ঋতুর সহিত আপন মহিমায় হিজল গাছ সৌন্দর্য বিলিয়ে দেয় উপাসকদের কাছে। গ্রীষ্মের প্রখর রোদে ছায়াঘন হিজল তলা হয়ে ওঠে শিশুদের কল্পনার ক্যানভাস, প্রকৃতির পাঠশালা। আবার বিকালের পশ্চিমা ছায়ায় রোজকার আবসাদ ভুলে যেতে গ্রাম্য হিজলতলা হয়ে উঠত বড়দের সুখ দুঃখ বিনিময়ের স্থান। বর্ষার থইথই জলে আধো আধো ডুবে যাওয়া হিজল পাতায় রোদ ঝিকমিক খেলে, জ্যোৎস্নায় মাখোমাখো ছোট বড় ঢেউ খেলে তার শিকড়ের কাছে। বসন্তের কচিপাতায় ভুলে যাওয়া শীত নিয়ে রঙিন আল্পনা এঁকে শুকিয়ে যাওয়া নদী তটে একা বা সারিসারি দাঁড়িয়ে থাকে।

হিজল গাছ কেউ লাগায়না। প্রকৃতির আপন স্নেহে জন্মায়, বেড়ে ওঠে। প্রখর গ্রীষ্মের শেষ দিকে ফুল ফুটে এই গাছে। লাল-গোলাপি আভার ঝুরি দুলতে থাকে দক্ষিণা বাতাসে। অপূর্ব সেই দোলন আরও নৈসর্গিক হয়ে ওঠে যখন আকাশে কালবৈশাখীর কালো মেঘ ছুঁয়ে ফেলে গোটা নদীতট, জলাভুমিকে। শান্ত অথচ কঠিন হৃদয় নিয়ে সারিবদ্ধবা একাকী দাঁড়িয়ে থাকে এই গাছ। ঐ সময় জলজ পাখিরা আশ্রয় নেয় তার ঝুপড়ির মতো চেহারায়। এই গাছের সাখা প্রশাখার বিন্যাস এমনি তৈরি, যা ভারি নিরাপদ ঝড় বৃষ্টির সময়। প্রাক বর্ষায় পরিণত ফুল থেকে সবুজ রঙের ফল ধরে। ঐ ফল আপনা আপনি ঝরে পড়ে, ভেসে যায় জলের স্রোতে। কোথাও মাটির স্পর্শ পেলে নোঙর করে, শুরু হয় অঙ্কুরের প্রস্তুতি। এভাবেই প্রাচীন কাল হতে নদীমাতৃক অববাহিকায় হিজল গাছ হয়ে উঠেছে এক নিরাপদ আশ্রয়, নিদারুণ সৌন্দর্যের প্রতীক।

জানা যায় গাছটির প্রাথমিক ঠিকানা আমাদের দেশ ভারতবর্ষ,। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নানান দেশে এর বিস্তার ঘটেছে প্রাকৃতিক কারনে। 'হিজল' শব্দটি

বাংলা। এর সংস্কৃত নাম 'নিচুল'। ইংরেজি নাম Indian Oak। বৈজ্ঞানিক নাম *Barringtonia acutangula* গাছটি মাঝারি ধরনের উচ্চতা বিশিষ্ট দীর্ঘজীবী গাছ। ছোট ডাল পালা বিশিষ্ট ঘন জালিকার ন্যায় এর বাহার। সমগ্র গাছটির পাতার বিন্যাস এমনই ঘন যা গাছের ভেতরের কোন কিছুকে বাহিরের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখে। গাছের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কান্ডে এক প্রকার গম্বুজাকৃতির অবয়ব তৈরি হয়। সবচেয়ে বিস্ময়ের যে গাছটি আবহাওয়ার যে কোন পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকতে সক্ষম। এই গাছের বেঁচে থাকর সংগ্রাম অদম্য। বন্যার সময় দিনের পর দিন হিজল গাছ সম্পূর্ণভাবে জলে ডুবে থাকলেও এর প্রাণের সংশয় ঘটে না।

হিজল গাছ, জলাভূমির কঠিন পরিস্থিতিতে টিকে থাকা একটি গাছ, যা জলজ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। বেশ কিছু জলজ পাখির ও মাছের জীবন চক্রের সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক। এই গাছ তাদের আশ্রয়, আহারের উৎস, শত্রুর থেকে নিরাপত্তা দেয়। কেলেঘাই নদীর চিতল, ফলুই, নেদস, বাইম, চিংড়ি মাছেরা ডুবন্ত হিজল গাছের গুঁড়িতে বাসা বাঁধে। এদের ফল ও ফুলের পাপড়ি মাছেরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। কেলেঘাই নদীর আশে পাশের জেলেরা নদীর মধ্যে কৃত্তিম মাছের অভয়ারণ্য (বাসা) তৈরি করতে হিজল গাছের ডাল ব্যবহার করে। এক বিশেষ ক্ষমতায় এই গাছের ডালাপালা নদীর মাছেদের আশ্রয় দিতে সক্ষম যা অন্যান্য গাছের ডালপালার সেই ক্ষমতা নাই। জেলেরা এই গাছের ডাল বারংবার একই কাজে ব্যবহার করে কারণ জলের নীচে এরা অনেক বছর অক্ষত থাকে। শুধু নদীর বাস্তুতন্ত্রে নয়, পরিণত হিজল গাছের কান্ড দিয়ে গৃহস্থলির অনেক ধরনের আসবাব পত্র এক সময় বানানো হত।

মনুষ্য সমাজের অহমিকায় কিম্বা অনিহায় বাংলার জলাভূমি গুলি থেকে হিজলের গাছ আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন। এই গাছের সৌন্দর্য কোন অংশেই এখনও কমতি পড়েনি শুধু মানুষেরা ভুলে গেছে তাকে। চাহিদার পরিসর থেকে এই গাছ নিজিকে লুকিয়ে রাখে নির্জনে নিভৃতে। আজো দুয়েকটি হিজল গাছ বাসন্তী বাতাসে উঁকি দেয় আর গ্রীষ্মের বিকেলে ফুলের সজ্জা সাজিয়ে বসে থাকে। তুমি আমি না দেখার ভানে তার পাশ কাটিয়ে গেলেও বাংলার পাখিরা ঠিক চিনতে পারে তাকে। তাই হতাশায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস গেয়ে উঠেন-

‘হাওরের পানি নাইরে হেথায়, নাইরে তাজা মাছ
বিলের বুকে ডালা মেলা, নাইরে হিজল গাছ’।

কেলেঘাই নদীর চরে হিজল গাছ, স্থান- নেধুয়া, সবং, পশ্চিম মেদিনীপুর।

# ।। কেলেঘাই নদীর ভূমিরূপগত বৈশিষ্ট্য ও বন্যা।।

সু ব্র ত  জা না

কেলেঘাই নদীর গতিপথের একটি বিশেষ অঞ্চলের বর্ণনা আমাদের সকলের জানা প্রয়োজন, তা নাহলে এই নদী অববাহিকা অঞ্চলের বন্যা ও তার ভয়াবহতা আমাদের পক্ষে সঠিক রূপে জানা সম্ভব নয়। কেলেঘাই ও কোপালেস্বরী নদী লাঙ্গলকাটা এলাকায় মিলিত হয়ে প্রথা বহির্ভুত আচরণে উত্তর দিকে বাহিত হয়েছে (চাবুকুয়া বা কাটাখালী পর্যন্ত), যা বর্তমানে আমাদের এই দক্ষিণ বঙ্গের কোনো নদীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। যদিও নদী পথের এই বিশেষ বহমানতা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বর্তমানের আঞ্চলিক ভূপ্রকৃতি ও অতীতের জল নির্গমন পদ্ধতির কারণে।

অতীতে এই নদী প্রবাহিত এলাকাটি একটি উপহ্রদ (লেগুন) অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল, এবং সম্ভবত এই কেলেঘাই ও হলদি নদীর প্রবাহপথ এলাকাটি ঐ উপহ্রদের সমুদ্রের সাথে যুক্ত ছিল, যেটা দিয়ে সমুদ্রের জল জোয়ার ও ভাটার মাধ্যমে ঐ এলাকায় যাতায়াত করতে পারতো। বিষয়টা ঠিক আজকের দিনের চিল্কা হ্রদ (উপহ্রদ) যে ভাবে অবস্থিতি ও তার সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত অঞ্চল, যেটি নিউমাউথ এলাকা হিসাবে পরিচিত, সেরকমই ছিল এই এলাকাটি।

অন্য দিকে, এই উপহ্রদ এলাকার সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে সামুদ্রিক ও নদী বাহিত পলি ও বালি সঞ্চিত হয়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিভাগ তৈরী করেছে, যা উচ্চ এলাকা থেকে বাহিত জল ও পলি সহজে সমুদ্রে যেতে বাধা পেতে থাকে। সুতরাং, এই উপহ্রদ এলাকাটি উচ্চ এলাকা থেকে বাহিত নদীর পলি সঞ্চয় করে প্রাথমিক ভাবে জলাভূমি ও পরে অবনত ভূমিরূপে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং, এই অঞ্চলের বন্যা প্রবণতার প্রকৃত কারণ হিসাবে এর অনন্ঞলিক ভূমিরূপের উৎপত্তি ও ভূমির বিবর্তনের ইতিহাস প্রধানত দায়ী।

আলোচনা, প্রসঙ্গ ও সচেতনতা- "...ও কেলেঘাই" ওয়েব জার্নালের উদ্যোগে, স্থির চিত্র

# ।। কেলেঘাই ও বাগুই নদীর তীরে উপভাষা।।

শ্রী দে বা শী ষ কু ই লা

কোন ভাষা (বাংলাভাষা) যদি বিস্তীর্ণ সীমানা জুড়ে প্রচলিত ও প্রসারিত থাকে তবে কোন কোন অঞ্চলে এই ভাষা বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা বলে। আর আঞ্চলিক ভাষাকে মূল ভাষায় উপভাষা বলা হয়। আমাদের নদী মাতৃক বাংলাদেশের কেলেঘাই ও বাগুই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেও বাংলা ভাষা ব্যবহারের নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বেলদা, নারায়ণগড়, সবং, পটাশপুর ও ময়না প্রভৃতি থানা এলাকায় সাধারণ মানুষজন তাদের প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে যে কথ্য ভাষা ব্যবহার করেন। মূল ভাষা বাংলা সঙ্গে ধ্বনিতা ও রূপতাত্ত্বিক নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নদীর তীরবর্তী মানুষজন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করেন। কয়েকটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করে দেখা যাক---

ক) আমানে আইজ ডাঙ্গা ধারে রুইতে যাবো।

খ) তোর মনে তাড়াতাড়ি চঅ।

গ) কিরে কাই যাউড়ু?

ঘ) কোথায় যাবে হে?

ঙ) মাছটা চঁচামাইকা পাইল?

চ) কেমা যাব কাকু?

ছ) ম্যুঁইয়্যা পুড়ু, মরুনি, শুধু চ্যাঁচাউটু।

জ) ওলাউঠা বৃষ্টি,কবে যে হবে, কি গরম পড়েছে গো?

ঝ) ওরে....রে... বাপরে কি শীত গো?

ঞ) মুই তো সউমা যাই থিলি।

ট) মোরে মায়াঝিটাকে কত কষ্ট-করিয়া বেয়া দিলি এক মাস হয়নি স্বামীর ঘরনু পাইসু।

ঠ) মনকের তো বয়স হইল, যেন চট কইরা চাইয়া যাই।

ভাষা বিশ্লেষণে প্রধানত দুটি ভাগ লক্ষ্য করা যায় । ক) ধ্বনি তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও খ) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। এই ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মূলত শব্দের উচ্চারণগত দিক বিশ্লেষণ করা হয়। আর রুপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ব্যকরণগত দিক বিশ্লেষণ করে দেখাহয়। আলোচ্য বাক্য গুলিতে আমরা এই বৈশিষ্ট্য গুলি অনুসন্ধান ও আলোচনা করবো। আলোচ্য প্রথম দুটি কাব্য আমারমনে ='আমার+মনে'

তোরমনে ='তোর+মনে'

'-মনে' নির্দেশিকাটি বহু বচন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা সাধারণত 'গুলি', 'রা' ইত্যাদি নির্দেশক বহু বচন বোঝাতে ব্যবহার করি কিন্তু এই অঞ্চলে '-মনে' নির্দেশক ব্যবহৃত হয়। এটি এই অঞ্চলের উপভাষা বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা যেতে পারে। তাছাড়া আজি>আইজ, চঁচামারিয়া>চ্যাঁয়াইর্য প্রভৃতি অপিনিহিত ও জাত ধ্বনী পরিবর্তন ও লক্ষ্য করা যায়। আবার তৃতীয় ও সপ্তম বাক্যে (যাউটু/চ্যাঁচাউটু) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে 'ঘটমান বর্তমান কালে', 'উঠু' বিভক্তির ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। চতুর্থ বাক্যের শেষে- কোথায় যাবে/ হে/ এই ধরনের পুঙ্গঁ ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। সাধারণত সবং থানা এলাকায়। খেয়েছ নাকি হে, তুমি আজ আসবে নাকি হে ইত্যাদি। আবার ষষ্ঠ বাক্যে - 'কেমা যাব কাকু', 'কেমা' শব্দটি বিশেষ ভাবে ওড়িয়া ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় মূলত বেলদা, নারায়ণগড় প্রভৃতি থানায় গ্রামীণ উপভাষা ওড়িয়ার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'মুই' শব্দটিও মনে হয় উড়িয়া 'মু' শব্দের সঙ্গে 'ই' যুক্ত হয়ে অন্তস্বরাগম ঘঠেছে-- 'মু+ই = মুই' আবার আমারে>মোরে, আমাদের>মনকের শব্দের স্বল্প

ঘটেছে বলা যেতে পারে। সব শেষে বলা যায় আজকের আলোচনার এই স্বল্প পরিসরে সামান্য কয়েকটি বাক্য নিয়ে নদীর তীরবর্তী আঞ্চলিক ভাষার বিশেষ বিশেষ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা গেল। যা এই অঞ্চলে বিশেষ এক বাংলা ভাষার পরিচয় প্রদান করে।

আলোচনা, প্রসঙ্গ ও সচেতনতা- "...ও কেলেঘাই" ওয়েব জার্নালের উদ্যোগে, স্থিরচিত্র

শামুক খোল – কেলেঘাই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের পরিযায়ী পাখি

## ।।ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইলের এক বিলুপ্তপ্রায় জনজাতি 'কোরঙ্গা' ।।

চৈ তা লি কু ণ্ডু না য়ে ক

ঝাড়গ্রাম জেলার দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত একটি খুব ছোট্ট জনপদ সাঁকরাইল, যা সেটলমেন্ট নক্সা-পরচায় 'শাঁকরাড়' মৌজা হিসেবে উল্লেখ আছে। এই মৌজাটির নামেই পরবর্তী সময়ে সাঁকরাইল থানা এবং ব্লক গড়ে ওঠে। ঝাড়গ্রাম জেলার একটি ব্লক। সাঁকরাইল ব্লকটির ভূ-প্রকৃতি ও জনজাতির মধ্যে বৈচিত্র্য অসীম। ব্লকটির দক্ষিণ প্রান্ত সীমা ছুঁয়ে বয়ে চলেছে সুবর্ণরেখা নদী এবং এই দক্ষিণ ভাগেই আছে আর এক নদী ডুলুং। আবার সাঁকরাইল ব্লকেরই উত্তর-পূর্বদিকের খুব অল্প অংশ দিয়ে কেলেঘাই নদীটি ও প্রবাহিত হয়েছে। সুদূর অতীতে সাঁকরাইল ব্লকের প্রায় সমগ্র অঞ্চল ছিল অনার্যদের প্রিয় নিকেতন। ডুংরি, টাঁড় সহ রুক্ষ কঠিন ল্যাতেরাইট শিলার ওপর গড়ে ওঠা বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চল ছিল তাদের নিরাপদ বাসভূমি। চাকরি ও ব্যবসা সূত্রে দীর্ঘকাল পরে এখানে প্রবেশ করেছে আর্যরা। ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারাতে ধীরে ধীরে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির এক অপরূপ মেল বন্ধন এখানে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন জনজাতির মিলন ক্ষেত্র হলেও 'কোরঙ্গা' নামে একটি জনজাতি এই ব্লকে এখন বিলুপ্তপ্রায়। ঝাড়গ্রাম জেলার অল্প কয়েকটি জায়গায় এই জনজাতি থাকলেও সাঁকরাইল ব্লকের একমাত্র কুলটিকরি গ্রামটিতেই এই জনজাতি দেখা যায়। এই 'কোরঙ্গা' কারা?

কোরঙ্গা নামটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি কাহিনি। জানিনা কতটা সত্যি ! উড়িষ্যার কোনারকের সূর্য মন্দির চিরকালই পর্যটকের চোখে এক অপার বিস্ময়। তার কারন কোনারক মন্দিরের অনুপম স্থাপত্যকলা। এক সময় শিল্পীদের

হাতের সুনিপুন কৌশলে গড়ে উঠেছিল এই মন্দিরের সৌন্দর্য। মন্দির নির্মাণ শেষ হওয়ার পরে পরেই মন্দির তৈরির কারিগরদের ওই স্থান ত্যাগ করে যাওয়ার নির্দেশ ছিল রাজার। তাই নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পরেই রাজার আদেশে পাছে মাথা থেকে ধড় বিচ্ছিন্ন হয় সেই ভয়ে সূর্যোদয়ের আগেই এক দুঃসাহসিক কিশোর শিল্পীকে পরিত্যাগ করেই সহশিল্পীরা দূরবর্তী জনপদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। তাদেরই উত্তর পুরুষেরা পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাসে কোরঙ্গা নামে পরিচিত।

আসলে কোরঙ্গা হল ভারতের একটি প্রাচীন জনজাতি 'দ্রাবিড়' বা 'তামিল' জনজাতির এক শাখা। অবিভক্ত মেদিনীপুরের সীমান্তে অবস্থিত উড়িষ্যা। তাই এক সময় উড়িষ্যা থেকে বেশ কিছু দ্রাবিড় জাতির ছোটো ও বড় শাখা গুলির অনুপ্রবেশ ঘটেছে এই বাংলায় এবং ধীরে ধীরে এখানকার জনজাতির মধ্যে মিশে গেছে। তবে এদের নিজস্ব ভাষা হারিয়ে গেলেও দ্রাবিড় ভাষার বিভিন্ন উপাদান বাংলাতে ঢুকে যায় এবং বাংলা ভাষাকে পুষ্ট করে। এই ভাবেই মেদিনীপুরের লোকভাষার মধ্যে থেকে গেছে বহু দ্রাবিড় শব্দ। এই ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কিছু আদিবাসী ও আছে। যেমন ওঁরাও বা কুড়ুখ ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ, ব্রাহুই, নায়েকী, মালপাহাড়ি বা মালতো, কাকমারা ইত্যাদি। কোরঙ্গাদের মাতৃ ভাষা আসলে গোন্ড বা কুই। কোরঙ্গারা দক্ষিণ ভারতে ট্রাইব হিসেবে চিহ্নিত হলেও এখানে তপশিলি জাতি হিসেবে পরিচিত।

মধ্যযুগের আগে থেকেই সারা বাংলায় এরা ছড়িয়ে পড়ে এবং নিজস্ব ভাষা ভুলে বাংলাকেই মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করে। পেশা হিসেবে প্রধানত ছুতার মিস্ত্রির কাজকে বেছে নিলেও কোথাও আবার পাথরের জিনিসপত্র তৈরির কাজকেও জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে। কুঁদ-এর সাহায্যে পাথরের থালা, বাটি, গ্লাস প্রভৃতি নানা জিনিসপত্র বানায় এরা। যেমন বেলপাহাড়ি, শিলদা, শিমূলপাল প্রভৃতি

অঞ্চলে এরা পাথরের জিনিসপত্র তৈরি করে। পাথরের তৈরি থালা, বাটি, গ্লাস, সরা প্রভৃতি দেব অর্চনায় কাজে লাগে। এই সব সামগ্রীতেই দেবতাকে সাধারণত ভোগ নিবেদন করা হয়। কুলটিকরিতে যে প্রায় ২০টি পরিবার আছে তারা স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষাতেই কথা বলে। বিশ্বকর্মা এদের উপাস্য দেবতা। পুজো করে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে। পুজোর দিন উপবাস করে পুজো করে। দেবতাকে ভোগ নিবেদন করার পরে উপবাস ভঙ্গ করে।

বিয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত বর্ণ হিন্দুদের আচার ও রীতি পালন করে। পুজো পার্বণ ও বিবাহ কার্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরাই নিয়োজিত হয়। এদের সমাজেও পণ প্রথা ও ঘটকালি স্বীকৃত। জন্ম ও মৃত্যুর নিয়ম ও আচার অন্যান্যদেরে মতোই। নবজাতকের জন্মের ছয় দিনের দিন মা ষষ্ঠীর পুজো করে। কাঠের কাজে এরা ভীষণ পারদর্শী। তবে অনেক আগে এরা শিং থেকে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতো। এদের পদবী বেরা, দিগার, সাহা, ইত্যাদি। বর্তমানে নিজেদের নিজস্ব জীবিকার সঙ্গে টুকটাক অন্যান্য কাজও করে থাকে অনেকে।

প্রথমে এরা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হত। ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের বাটিঝুরি গ্রামের কোরঙ্গাদের সঙ্গেই বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে আত্মীয়তা স্থাপন করতো। কিন্তু বর্তমানে এদের অনেকেই অন্য জাতির সঙ্গেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। তাই সাঁকরাইল ব্লকে এই জাতিটি আস্তে আস্তে আরও বিলুপ্তির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।

তথ্যঋনঃ

1. সাঁকরাইল থানার পশ্চৎপদ জন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়-মণীন্দ্রনাথ ষড়ঙ্গী। শেকড়ের খোঁজে, সম্পাদনা- আজহারউদ্দীন খান্

2.জনজাতি-ড.সুহৃদকুমার ভৌমিক। জঙ্গলমহল কথা, সম্পাদনা-তাপস মাইতি

বিশেষ কৃতজ্ঞতা-অজিত কুমার সাহু

# ।।আলোচনা-কেলেঘাইর অতীত ঐতিহ্য।।

কৃ ষ্ণ গো পা ল চ ক্র ব র্তী

"নদী বাঁচাও সভ্যতা বাঁচাও" শীর্ষক আলোচনার মাধ্যমে যখন মানুষজনকে সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত করার ডাক আসে, আবার সেই নদী যখন আমার মাতৃসমা কেলেঘাই নিয়ে, তখন তার তীরবর্তী মানুষজনকে বোঝানোর দায়টাও নিজের উপরে কিছুটা হলে বর্তায় এটা মনে করি। সতীর্থ বন্ধু শিক্ষক গবেষক মৃন্ময়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার নিজ গ্রামে হাজির হয়েছিলাম রাজবংশী পল্লী যুব বৃন্দ আয়োজিত সরস্বতী মায়ের আরাধনার দিনে এক বিশেষ আলোচনা সভায়।

আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল-''কেলেঘাই নদীর ঐতিহ্য ও তীরবর্তী বাসিন্দাদের সমাজ জীবনে এই নদীর ভূমিকা''। আসলে নদীর ঐতিহ্য বলতে যা বুঝি তা হল নদীর স্বাভাবিক ছান্দসিক প্রবাহমানতা। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নিজস্ব একটা গতি প্রকৃতি নিয়ে নদী আপণ গতিতে এগিয়ে চলবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই গতি পথের আমরা পরিবর্তন করেছি নিজেদের সুবিধার কথা বলে। সাময়িক সুবিধা হয়তো পেয়েছিলাম। কিন্তু সুদূরপ্রসারী ফল কিন্তু ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতম হয়েছে। তার ফল কিন্তু আমরা হাতেনাতে পেয়েও গেছি। আসলে নদীর নিজস্ব ঐতিহ্য বলে আর কিছু নেই। উৎপত্তি স্থল ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল থানার দুধ কুন্ডি মৌজার অন্তর্গত বাদিনার ভূগর্ভস্থ জলাধারের চিরন্তনী অবিরাম ঊর্দ্ধ মুখী মিষ্টি জলের স্রোত কেশিয়াড়ী, খড়্গাপুর, নারায়নগড় হয়ে সবং পটাশপুরের সীমানা বরাবর নদী প্রশস্থ হয়ে পটাশপুরের চিস্তিপুর অঞ্চলের মধ্য দিয়ে আমগাছিয়া মংলামাড়োর মাঝ খান দিয়ে নদী ইটাবেড়িয়া কালিনগর হয়ে রসুলপুর গিয়ে পতিত হতো। আসলে নদীটি ছিল দক্ষিণ

পূর্বমুখী। আর মাতব্বররা আমাদের ভালো করার কথা বলে আমগাছিয়াতে উঁচু বাঁধ দিয়ে নদীটিকে পূর্বমুখী করে কাঁসাই নদীর সঙ্গে মেশানো হয়েছে। এর ফলে নদীর বিদ্রোহের আঁচটা আমরা ২০২১ সালে ভালোই অনুভব করেছি। আর চরদখল করে ইঁট ভাটা কিংবা নদীর বাঁধ ঘেঁসে ভেড়ি তৈরি করা আবার কোথাও বাঁধাল দিয়ে নদীর গতিপথকে অবরুদ্ধ করা নদী শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করেছে। এই রকম চলতে থাকলে আমারা আমাদের মাতৃসমা কেলেঘাই নদী নালাতে রূপান্তরিত হবে। আর আমরা যারা ওর তীরবর্তী সন্তান সন্ততি, তাদের কাছে নদী তখনই প্রকৃত অর্থে দুঃখের কারন হয়ে দাঁড়াবে। আসলে অতি বৃষ্টির দরুন বন্যার কারনে যতোটা ক্ষতিগ্রস্থ হতাম আমরা, বন্যার জল নেমে যাওয়ার পর তার কয়েক গুণ বেশি উপকৃত হতাম। সেদিনের যন্ত্রনা যদি সত্যিই যন্ত্রনা হয়, তাহলে বলে রাখা ভালো যন্ত্রনার বিভীষিকাকি! সেটা আমাদের আগামীতে আরো বেশি বেশি করে দেখতে হবে। যার ট্রেলার কিন্তু নদী দেখিয়েছে।তাই সময় থাকতে আমাদের কেলেঘাই এর সুস্থতার জন্য ভাবতে হবে। তবেই আমরা সুস্থ থাকতে পারবো। এই কথা গুলো শোনানোর জন্য আমরা কয়েকজন উপস্থিত ছিলাম, যারা প্রত্যেকেই কেলেঘাই তীরবর্তী জনপদের অংশ।

উপস্থিত ছিলেন- ১.বিষ্ণুপদ দাশ-সহকারী শিক্ষক

২. সঞ্জীব মন্ডল-প্রধান শিক্ষক

৩.মানস মন্ডল-সহকারী শিক্ষক

৪.ধনঞ্জয় মন্ডল-সহকারী শিক্ষক

৫.তাপস সাউ-প্রধান শিক্ষকও আমি।

আমরা সবাই এই বার্তা টুকুই দেই আগামীতে সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই জোরদার করতে হবে। আওয়াজ তুলতে হবে-

"কেলেঘাই বাঁচলে আমরা সবাই বাঁচবো"

জন্ম–১২ইএপ্রিল, ১৯৫২

প্রয়াণ- ৯ইডিসেম্বর, ২০২২

কেলেঘাই নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুস্থ সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল প্রাণ- বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী রাগপরাগ সংগীত শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ প্রয়াত বাণেশ্বর প্রধান

স্মরণে "...ও কেলেঘাই" বিশেষ পৃষ্ঠা

# "স্মৃতির আলোয় তুমি আজও"